এইডস মানেই মৃত্যু নয়: প্রতিরোধই একমাত্র উপায়

ডা. জাকির হোসেন

মানবসভ্যতাকে আজ যে-কটি রোগ হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে, এইচআইভি/এইডস সেগুলোর মধ্যে একটি। এইডস একাধারে একটি মারণ এবং সংক্রামক ব্যাধি। সারা বিশ্বেই আজ এই রোগটি ছড়িয়ে পড়েছে। এই রোগের ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করলে শরীরের রোগপ্রতিরোধক কোষ যেমন - হেলপারটি সেল, মনোসাইট, ম্যাক্রফেজ, ডেনড্রাইটিক সেল, চর্মের ল্যাঙ্গারহেন্স, মস্তিষ্ক ও গোয়াল সেল ইত্যাদিকে আক্রমণ করে এবং সেগুলোকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেয়। ফলে মানব দেহের স্বাভাবিক রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তখন যে -কোনো সংক্রামক জীবাণু সহজেই এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিকে আক্রমণ করতে পারে। এইচআইভি ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার অবস্থাকে এইডস বলে। এই অবস্থায় শরীরে প্রতিরোধ করার মতো কার্যকরী কোষ না থাকায় বিভিন্ন রোগ মারাত্মভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং শরীরে নানা উপসর্গসহ এর বিস্তার ঘটায়।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রতি বছর ১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হয়। ১৯৮৮ সাল থেকে দেশে দেশে এ দিবসটি পালিত হয়ে আসছে। উদ্দেশ্য এই রোগ সম্পর্কে জানা এবং এর প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পৃথিবীতে প্রায় ৪ কোটি মানুষ শরীরে এইডসের জীবাণু বহন করে চলেছেন এবং একে নিয়েই বেঁচে আছেন , কিন্তু তার মধ্যে প্রায় ১ কোটি লোকের কোনো ধারণাই নেই যে , তাঁদের শরীরে এই ঘাতক ভাইরাসটি রয়েছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য - 'সারা বিশ্বের ঐক্য, এইডস প্রতিরোধে সবাই নিব দায়িত্ব (Global Solidarity, Shared Responsibility)

এইডস এর পুরো নাম হচ্ছে একোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েনসি সিনড্রম। যার অর্থ হচ্ছে দুর্বল শারীরিক রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থা যা রোগী নিজেই অর্জন করেছে। এইডস রোগটির জীবাণুই হচ্ছে ভাইরাস। এই ভাইরাসের সংক্ষিপ্ত নাম এইচআইভি। যার পুরো নাম হলো হিউম্যান ইমিউনো ভাইরাস। এই ভাইরাস এক প্রকার জীবাণু যা ব্যাকটেরিয়া থেকেও ছোটো এবং সাধারণ মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা যায় না।

বিশ্ব জুড়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে এখনো এ রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি। যন্ত্রণাদায়ক অকাল মৃত্যুই হচ্ছে এ ঘাতক রোগে আক্রান্তদের শেষ পরিণতি। প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে বিশ্ববাসী এ রোগ নিয়ে দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কগ্রস্ত। কারো শরীরে এইচআইভি আছে কি-না তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। শুধুমাত্র রক্ত পরীক্ষা করে এ ভাইরাসের সংক্রমণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। এইডসের ভাইরাস দ্বারা সংক্রমণ হওয়ার কত বছর পর এইডস হবে তার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। কায়েক মাস কিংবা ১০-১৫ বছরের মধ্যে এই রোগ দেখা দিতে পারে। তবে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জনের ১০ বছরের মধ্যেই এইডস হয়েছে।

এই নিরব ঘাতকের জন্ম কোথায় , কিভাবে তা নিয়ে এখনো বিজ্ঞানীদের মধ্যে চলছে বিতর্ক। তবে গবেষণা করে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে , পঞ্চাশের দশকে আফ্রি কার প্রত্যন্ত অঞ্চলে দরিদ্র কৃষক শ্রেণির মধ্যে প্রথম এ রোগ বিস্তার লাভ করে। এরপর ষাট ও সত্তরের দশকে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও কিছু কিছু এইডসের জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। কোনো - কোনো গবেষকের মতে মধ্য আফ্রিকার এক প্রকারের সবুজ বানরের দেহে সর্বপ্রথম এইডস বা এইচআইভি ভা ইরাসের উপস্থিতি দেখা যায়।

১৯৮০ সালে সর্বপ্রথম এ ঘাতক রোগটি শনাক্ত করা হয়। ১৯৮১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু নিউমোনিয়ার রোগী পাওয়া যায় যার কারণ নিউমোসিস্টিস ক্যারিনিয়াই নামক একটি জীবাণু , যার বর্তমান নাম নিউমোসিস্টিস জিরোভেসি। পরে আফ্রিকায় প্রাদুর্ভাব ঘটে ক্যাপোসিস সারকোমা নামক একটি টিউমারের। এ টিউমার থেকেই রোগটি শনাক্ত করা হয়। মারণব্যাধি এইডসের উৎপত্তি ভূমি চিহ্নিত করার দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। ১৯২০ এর দশকে কঙ্গোর রাজধানী কিনশাসায় (তৎকালীন লিওপোল্ডভিল) অনিয়ন্ত্রিত যৌনাচারের ফল হিসেবে এইডসের সৃষ্টি হ য় বলে নতুন এক গবেষণায় উঠে এসেছে। কিনশাসায় লাগামহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে অনিয়ন্ত্রিত যৌনাভ্যাসই এইডস সৃষ্টির মূল কারণ।

প্রকৃতপক্ষে এইডসের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষণ নেই। দেশ ও স্থানভেদে এইডসের লক্ষণের পার্থক্য দেখা যায়। এইডসের কিছু সাধারণ লক্ষণ যেমন অনেকদিন বা বার বার জ্বর হয় কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না , অতিরিক্ত অবসাদ, শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস পাওয়া , লিম্ফগ্রন্থি ফুলে ওঠা, শুকনো কাশি, শ্বাসকষ্ট, হাড়ের জয়েন্টগুলো ফুলে থাকা , ঘন ঘন বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়া যেমন যক্ষ্মা , নিউমোনিয়া, প্রস্রাবের প্রদাহ। এ ছাড়া দীর্ঘদিন ডায়রিয়ার সমস্যা যা স্বাভাবিক চিকিৎসায় কোনোক্রমেই ভালো হয় না , দৃষ্টিশক্তির প্রখরতা কমে যাওয়া , তীব্র মাথাব্যথা ইত্যাদি। তবে কারও মধ্যে এসব লক্ষণ দেখা দিলেই তার এইডস হয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া যাবে না কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের মনে রাখতে হবে, এসব লক্ষণ দেখা দিলেই বিলম্ব না করে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

অসচেতনতা, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, সুস্থ জীবনের অনুশীলন না করাটাই এ রোগের প্রধান ঝুঁকি। সুনির্দিষ্টভাবে যেসব উপায়ে এইচআইভি ছড়াতে পারে তা হলো- এইচআইভি বা এইডস আক্রান্ত রোগীর রক্ত বা রক্তজাত পদার্থ অন্য কোনো ব্যক্তির দেহে পরিসঞ্চালন করলে; আক্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত টুথব্রাশ, সুচ, সিরিঞ্জ, ছুরি, ব্লোড বা ডাক্তারি কাঁচি সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত না করে অন্য কোনো ব্যক্তি ব্যবহার করলে ; আক্রান্ত ব্যক্তির অঙ্গ অন্য ব্যক্তির দেহে প্র তিস্থাপন করলে; এইচআইভি বা এইডস আক্রান্ত মায়ের মাধ্যমে (গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে বা সন্তানের মায়ের দুধ পানকালে); অনৈতিক ও অনিরাপদ বা কনডম ছাড়া যৌনমিলন করলে ; সমকামী, বহুগামী ব্যক্তি এবং বাণিজ্যিক ও ভাসমান যৌনকর্মীর সঙ্গে অরক্ষিত যৌনমিলনের মাধ্যমে ; যুবসমাজের মধ্যে নেশার আধিক্য এবং একই সিরিঞ্জের মাধ্যমে বার বার মাদকদ্রব্য গ্রহণ ; এইচআইভি আক্রান্ত বিভিন্ন দেশের সঙ্গে নিবিড় ভৌগোলিক অবস্থান, দীর্ঘ সীমান্ত এলাকা এবং এভাবেই বিভিন্ন দেশে আসা -যাওয়ায় উপরোক্ত উপায়ে এইচআইভি ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকে ; শ্রমিক অভিবাসন ও মানব পাচা রের ফলে এইডস আক্রান্ত জনগণের দেশে গমনাগমন এ রোগের ঝুঁকি বাড়ায় ; সর্বোপরি এইচআইভি সম্পর্কে সচেতনতা ও তথ্যের অভাবে রোগটি ছড়ানোর ঝুঁকি থাকে।

কিছু কিছু বিষয়ে অনেকের মধ্যে বিভ্রান্তি থাকে এইডসের বিস্তার নিয়ে। যেসব ক্ষেত্রে এইচআইভি ছড়ানোর সম্ভাবনা একেবারেই নেই, তা হলো- বায়ু, পানি, খাদ্য, মশা, মাছি বা পোকামাকড়ের কামড়ে; এইডস রোগীর ছোঁয়ায় বা স্পর্শে, হাঁচি, কাশি, থুথু বা শ্বাস -প্রশ্বাসের মাধ্যমে, করমর্দন, একই ঘরে বসবাস , মেলামেশা, চলাফেরা ও খেলাধুলা করলে ; আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত পায়খানা, বাথরুম, বেসিন, থালাবাসন, গ্লাস, বিছানা, বালিশ ইত্যাদি ব্যবহার করলে; এইডস রোগীর চিকিৎসায় কর্তব্যরত চিকিৎসক, নার্স ও অন্য স্বাস্থ্যকর্মীরাও ঝুঁকিমুক্ত; হাসপাতালে এইডস আক্রান্ত ভর্তি রোগীর আশপাশে অন্য রোগীদের ছড়ানোর ঝুঁকি নেই।

একবার আক্রান্ত হয়ে গেলে এর থেকে নিস্তার পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ। তাই এইচআইভি সংক্রমণের উপায়গুলো জেনে এর প্রতিরোধই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এইডস প্রতিরোধে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হলো - প্রয়োজনে অন্যের রক্ত গ্রহণের আগে রক্তদাতার রক্তে এইচআইভি আছে কিনা পরীক্ষা করে নেওয়া ; অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রেও অবশ্যই এইচআ ইভি পরীক্ষা করে নিতে হবে; ইনজেকশন নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবারই নতুন সুচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহার করা এবং অন্যের ব্যবহৃত সুচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহার না করা ; অনিরাপদ যৌন আচরণ থেকে বিরত থাকা, যৌন মিলনের সময় অবশ্যই কনডম ব্যবহার করা; এইচআইভি বা এইডস আক্রান্ত মায়ের সন্তান গ্রহণ বা সন্তানকে বুকের দুধ দেওয়ার ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া; ধর্মীয় অনুশাসন যথাযথভাবে মেনে চলা; জনসচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রতিরোধমূলক তথ্য নিয়মিত প্রচারের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন ও এইডস প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা ছাড়িয়ে এশিয়া মহাদেশেও এ রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত ইতোমধ্যে নাম লিখিয়েছে বিশ্বের প্রথম বৃহৎ এইডস রোগীর দেশ হিসেবে। প্রথম এইচআইভিতে আক্রান্ত ব্যক্তি শনাক্ত হয় ১৯৮৯ সালে। এরপর থেকে এখন পর্যন্ত দেশে জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইচআইভির সংক্রমণ শূন্য দশমিক শূন্য ১ শতাংশের কম। এ সংখ্যাটি এইচআইভি সংক্রমণের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নয়। তবে প্রতিবেশী দেশগুলোর কারণে এইচআইভির ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ। দেশে এখন পর্যন্ত ৭ হাজার ৩৭৪ জন শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে রোহিঙ্গা ১০৫ জন।

বাংলাদেশে ১৯৮৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ৭ হাজার ৩৭৪ জন এইচআইভি/এইডস রোগী শনাক্ত হয় এবং মৃত্যুবরণ করেছে ১৭০ জন। দেশের ২৩টি জেলায় এইচআইভি রোগী বেশি শনাক্ত হওয়ায় সেসব এলাকাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে সরকার। বর্তমানে দেশের ২৮টি পরীক্ষাকেন্দ্রে ১১টি সেবা সেন্টারে এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তিদের সেবা দেওয়া হচ্ছে। যার মধ্যে ৪টি সরকারি হাসপাতাল থেকে এইডস আক্রান্ত রোগীদের বিনামূল্যে ঔষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে মাসে একজন এইডস রোগীর পিছনে সরকারের খরচ ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা।

সরকার প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। সরকার টেকসই উ ন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) এইচআইভি/এইডস বিষয়ক লক্ষ্য অর্থাৎ ২০৩০ সালের মধ্যে দেশ হতে এইডস রোগটি নির্মূল করার জন্য জাতিসংঘের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই সরকারের পাশাপাশি আমরা সকলে মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমরা এইডস নির্মূল করতে সক্ষম হব।

এই মারণব্যাধি এইডসের হাত থেকে বাচাঁর জন্য সকলকে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করে তুলতে হবে। শুধু অসচেতনতার কারণে আমাদের দেশে এইডসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইডস প্রতিকারের ব্যবস্থা যেহেতু এখনো অজ্ঞাত, সেহেতু প্রতিরোধই হবে এইডস থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র পথ। প্রতিরোধের জন্য সৃষ্টি করতে হবে ব্যাপক গণসচেতনতা। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে উপযুক্ত কার্যক্রম নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সবশেষে প্রতিপাদ্যের সুরে বলতে হয় , আসুন ঐক্যের হাত তুলি , এইচআইভি প্রতিরোধ করি। এইচআইভি প্রতিরোধে জা না ও শোনার বিকল্প নেই , একে নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করার জন্য কাজ করতে হবে আমার, আপনার, আমাদের সবার।

#

২৯.১১.২০২০ পিআইডি ফিচার